بسم الله الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ২৩ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। আজও এই ধারা বজায় থাকবে। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, কুরআনের আয়াত- اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, এবং সেসব মানুষ যারা আহত হওয়ার পরেও আল্লাহ্ এবং রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মাঝে যারা পুণ্যকাজ করেছে করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এক মহা প্রতিদান (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)। এই বিষয়ে তিনি (অর্থাৎ, হযরত আয়েশা) উরওয়াকে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! যখন মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে আহত হন আর মুশরিকরা চলে গিয়েছিল তখন হুযূর (সা.)-এর আশংকা হয়, পাছে (তারা) আবার ফিরে না আসে। তিনি (সা.) বলেন, কে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন তাদের মধ্যে থেকে ৭০ জন মানুষ নিজেদের উপস্থাপন করেন, আর তোমার পিতা হযরত যুবায়ের এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উরওয়া বলতেন, তাঁদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান যখন গিরিপথে ছিল আর সে বলছিল, আগামী বছর এই দিনেই বদরের প্রান্তরে পুনরায় যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি থাকলো এবং মহানবী (সা.) তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তখন আবু সুফিয়ান দ্রুত তার সেনাদল নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। এর পরের ঘটনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

মহানবী (সা.) বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তৎক্ষণাৎ ৭০জন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করে কুরাইশ বাহিনীর পেছনে প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) অথবা কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে কুরাইশদের পেছনে প্রেরণ করেন; আর তাদেরকে বলেন, কুরাইশ সৈন্যরা পুনরায় মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে কিনা খবর নাও। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যদি কুরাইশ বাহিনী উটে আরোহিত থাকে এবং ঘোড়াগুলোকে আরোহীবিহীন নিয়ে যায় তাহলে বুঝবে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরত যাচ্ছে আর মদীনায় আক্রমণ করার ইচ্ছা রাখে না। আর তারা যদি অশ্বারোহী থাকে তাহলে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়। তিনি (সা.) তাদেরকে জোরালো নির্দেশ দেন যে, কুরাইশ বাহিনী যদি মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁকে অবহিত করা হয়। আর তিনি (সা.) অত্যন্ত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, কুরাইশরা যদি এখন মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে খোদার কসম! আমরা তাদের মোকাবিলা করে তাদেরকে এই আক্রমণ করার মজা টের

পাইয়ে দেবো। অতএব, মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত লোক তাঁর নির্দেশ অনুসারে যান এবং অতি দ্রুত এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন যে, কুরাইশ বাহিনী মক্কার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমাদের সাথে উম্মে আয়মানের কাছে চলুন, তাকে দেখে আসি; যেভাবে মহানবী (সা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তিনি অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা যখন তার কাছে যাই তখন তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তারা উভয়ে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা আছে তা তাঁর রসূলের জন্য উত্তম। তিনি বলেন, আমি জানি; যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে আছে তা তাঁর রসূলের জন্য উত্তম। কিন্তু আমার কান্নার কারণ হলো, এখন আকাশ থেকে ওহী অবতরণের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনি অর্থাৎ উম্মে আয়মান তাদের উভয়কেও কাঁদিয়ে ফেলেন; অর্থাৎ উভয়ে তার সাথে কাঁদতে থাকেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন, অথচ তোমরা বলেছ, 'তুমি মিথ্যাবাদী'; আর আবু বকর বলেছিল, 'আপনি সত্যবাদী'। আর সে নিজ প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, কেবল আবু বকর (রা.)-ই এমন মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাকে অস্বীকার করেছিলে, কিন্তু আবু বকর এমন ছিল যার মাঝে আমি কোন প্রকার বক্রতা দেখিনি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন মহানবী (সা.) এবং মক্কার কুরাইশদের মাঝে সন্ধিচুক্তি (সম্পাদিত) হচ্ছিল আর আবু জন্দলকে মহানবী (সা.) চুক্তির শর্তানুযায়ী ফেরত পাঠিয়ে দেন, তখন সাহাবীরা খুবই আবেগাপ্লুত ও উত্তেজিত ছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

মুসলমানরা এই দৃশ্য দেখছিল এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানে তাদের চোখ রক্তিম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সামনে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে ছিলেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.) আর সইতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদার সত্য রসূল নন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই এমনটিই। হযরত উমর (রা.) পুনরায় বলেন, তাহলে আমরা আমাদের সত্য ধর্মের এমন লাঞ্ছনা কেন সহ্য করবো? তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)'র (এহেন) অবস্থা দেখে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলেন, দেখ উমর! আমি আল্লাহ্র রসূল এবং আমি খোদার অভিপ্রায় কী তা জানি। আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি না, কেননা তিনিই আমার সাহায্যকারী। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতিগত উত্তেজনা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বলেন, আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ বা কা'বাগৃহ তওয়াফ করবো? তিনি (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এই তওয়াফ অবশ্যই এ বছরই হবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, না, এমনটি বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা করো, তোমরা ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কা'বা তওয়াফ করবে। কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় হযরত উমর (রা.) আশ্বস্ত হতে পারেন নি। যেহেতু মহানবী (সা.)-এর একটি বিশেষ প্রতাপ ছিল, তাই হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর

(রা.)'র কাছে আসেন এবং তার সাথেও এ ধরনের উত্তেজিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও একই ধরনের উত্তর দেন যেমনটি মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন; কিন্তু একইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) উপদেশের স্বরে বলেন, দেখ উমর! সংযত হও। আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর রশিতে যে হাত রেখেছ তা শিথিল হতে দিও না; কেননা খোদার কসম! এই ব্যক্তি যাঁর হাতে আমরা হাত রেখেছি, তিনি অবশ্যই সত্য। হযরত উমর (রা.) বলেন, সেসময় আমি উত্তেজনার বশে এসব কথা বলে বসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে আমার চরম অনুশোচনা হয় আর তওবার আদলে এই দুর্বলতার দাগ মোচন করার জন্য অনেক নফল ইবাদত করেছি। অর্থাৎ, সদকা করেছি, রোযা রেখেছি, নফল নামায পড়েছি এবং দাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই দুর্বলতার দাগ মুছে যায়।

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও লিখেছেন বা বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,

একবার মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাদেরকে অনেক আদেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি তোমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান লোকদের মাঝেও কখনো কখনো অভিযোগ করার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আবু বকরের মাঝে আমি এরূপ মনোভাব কখনো দেখতে পাইনি। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উমর (রা.)'র ন্যায় মানুষও বিচলিত হয়ে পড়েন; আর তিনি সেই বিচলিত অবস্থাতেই হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে যান এবং বলেন, আমাদের সাথে কি খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, আমরা উমরা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি বলেন, আমাদের সাথে কি খোদার এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, তিনি আমাদের সমর্থন ও সাহায্য করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, হ্যাঁ, ছিল। তিনি বলেন, তাহলে কি আমরা উমরা করেছি? হযরত আবু বকর বলেন, হে উমর! খোদা তা'লা কখন বলেছিলেন যে, আমরা এ বছরই উমরা করব? অতঃপর তিনি বলেন, আমরা কি বিজয় ও সাহায্য লাভ করেছি? হযরত আবু বকর বলেন, খোদা ও তাঁর রসূল বিজয় ও সাহায্যের অর্থ আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। কিন্তু উমর (রা.) এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নি। আর তিনি এই বিচলিত অবস্থাতেই মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদা তা'লার কি আমাদের সাথে এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, আমরা তাওয়াফরত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি নিবেদন করেন, আমরা কি খোদার জামা'ত নই আর খোদা তা'লার কি আমাদের সাথে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল না? তিনি বলেন, ছিল। হযরত উমর বলেন, তাহলে হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি উমরা করেছি? তিনি বলেন, খোদা তা'লা কখন বলেছিলেন যে, আমরা এ বছরই উমরা করব? এটি তো আমার ধারণা ছিল যে, এ বছরই উমরা হবে। খোদা তা'লা তো নির্দিষ্ট করে বলেন নি। তিনি বলেন, তাহলে বিজয় ও সাহায্যের কী অর্থ হলো? তিনি (সা.) বলেন, খোদার সাহায্য অবশ্যই আসবে আর তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই একই উত্তর মহানবী (সা.)ও প্রদান করেন।

এই উভয় রেওয়ায়েতে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর প্রথমে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, এরপর হযরত আবু বকরের কাছে গিয়েছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা বর্ণনা করেছেন তাতে মূল

কথা একই, কিন্তু এ অনুসারে প্রথমে হযরত আবু বকরের কাছে গিয়েছেন, এরপর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ব্যক্তি একে অপরকে ভর্ৎসনা করে। একজন ছিল মুসলমান আর অপরজন ছিল ইহুদি। মুসলমান ব্যক্তি বলে, সেই সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে পুরো বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তখন ইহুদি ব্যক্তি বলে, সেই সত্তার কসম যিনি মূসা (আ.)-কে পুরো বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এতে মুসলমান ব্যক্তি হাত উঠায় আর ইহুদি ব্যক্তির মুখে থাপ্পড় মারে। সেই ইহুদি ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং তার ও সেই মুসলমানের মাঝে যা ঘটেছে তা তাঁকে অবগত করে। তখন মহানবী (সা.) উক্ত মুসলমান ব্যক্তিকে ডাকেন আর তিনি (সা.) তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সেই ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে সব খুলে বলে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে মূসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, যেই মুসলমান সেই ইহুদিকে চপেটাঘাত করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

তিনি (সা.) বিধর্মীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিও অনেক যত্নবান ছিলেন। একবার হযরত আবু বকরের সামনে কোন ইহুদি বলে বসে যে, আমি মূসার কসম খাচ্ছি যাকে খোদা তা'লা সকল নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এতে হযরত আবু বকর তাকে চপেটাঘাত করেন। মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকরের ন্যায় মানুষকে ভর্ৎসনা করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, লক্ষ্য করে দেখ! মুসলমানদের শাসন চলছে। এক ইহুদি মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত মূসাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে আর এমনভাবে কথা বলে যে, হযরত আবু বকরের ন্যায় নম্র হৃদয়ের মানুষও উত্তেজিত হয়ে পড়েন আর তাকে থাপ্পড় দেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে তিরস্কার করেন এবং বলেন যে, তুমি কেন এমন করেছ? তার যা ইচ্ছা বিশ্বাস পোষণ করার অধিকার আছে। যদি এটি তার বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে তার একথা বলার অধিকার রয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রেম ও ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রেমময় সম্পর্ক ছিল । তিনি যখন মদিনায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা করেন তখনও তার সম্পর্ক প্রেমিকসুলভ ছিল, আর যখন তাঁর মৃতুর সময় হয় তখনও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যেমন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (সূরা আন্ নাসর) ওহী অবতীর্ণ হয় যাতে তাঁর (সা.) মৃত্যুর সংবাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তখন মহানবী (সা.) খুতবা প্রদান করেন এবং তাতে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজের এক বান্দাকে স্বীয় সাহচর্য ও জাগতিক উন্নতির মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন; আমি খোদা তা'লার সাহচর্যকে প্রাধান্য দিয়েছি। এই সূরা শুনে সকল সাহাবীর চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠে। আর সবাই আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করতে আরম্ভ করেন এবং বলতে থাকেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্, এখন সেই দিন আসতে যাচ্ছে! কিন্তু যখন অন্য সবাই আনন্দিত ছিল, হযরত আবু বকর (রা.) ডুকরে কেঁদে উঠেন এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা

এবং স্ত্রী-সন্তান সবাই উৎসর্গিত। আপনার জন্য আমরা সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ যেভাবে কোনো প্রিয়জন রোগাক্রান্ত হলে ছাগল জবাই করা হয়, সেভাবেই হযরত আবু বকর নিজেকে ও নিজের সকল প্রিয়জনকে মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁর কান্না দেখে আর এই কথা শুনে কতিপয় সাহাবী বলেন যে, দেখ, এই বৃদ্ধের কী হয়েছে! আল্লাহ্ তা'লা কোনো বান্দাকে সুযোগ দিয়েছেন যে, সে (খোদার) সাহচর্য বা জাগতিক উন্নতিকে বেছে নিতে পারে, আর সে (খোদার) সাহচর্য গ্রহণ করেছে; এই ব্যক্তি কেন কাঁদছে? এখানে তো ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। এমনকি হযরত উমরের ন্যায় মহান সাহাবীও এতে আশ্চর্য হন। মহানবী (সা.) মানুষের এই বিস্ময়কে অনুভব করেন এবং হযরত আবু বকরের অস্থিরতাকে দেখেন ও তার সান্ত্বনার জন্য বলেন, আবু বকর আমার কাছে এত প্রিয় যে, খোদা তা'লাকে ছাড়া যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো বৈধ হতো তাহলে আমি তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম; কিন্তু এখনও সে আমার বন্ধু ও সাহাবী। অতঃপর বলেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, আজ থেকে আবু বকরের জানালা ব্যতিরেকে মসজিদের দিকে যত জানালা খুলে, সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক। এভাবে মহানবী (সা.) তাঁর ভালোবাসার সম্মান দিয়েছেন, কেননা এই ভালোবাসা পরিপূর্ণ ছিল যা হযরত আবু বকর (রা.)-কে জানিয়ে দিয়েছিল যে, এই বিজয় ও সাহায্যের সংবাদের পেছনে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ (লুক্কায়িত) রয়েছে। তিনি নিজের এবং নিজ প্রিয়জনদের প্রাণ নিবেদন করে বলেন, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আপনি জীবিত থাকুন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতেও হযরত আবু বকর ভালোবাসার এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বস্তুতঃ হযরত আবু বকর সওর গুহায় নিজ প্রাণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেননি, বরং মহানবী (সা.)-এর জন্য তা প্রকাশ করেছিলেন। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেখানেই (উৎকণ্ঠা) প্রকাশ করেছেন সেখানে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে তা করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থলে বলেন, বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র মাঝে কোন এক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় আর বিতর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত উমর (রা.) যেহেতু রাগী স্বভাবের ছিলেন তাই হযরত আবু বকর (রা.) সেখান থেকে চলে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন যেন বিবাদ শুধু শুধু সীমা ছাড়িয়ে না যায়। হযরত আবু বকর (রা.) চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত উমর (রা.) এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামা টেনে ধরে বলেন, আমার কথার উত্তর দিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) জামা ছাড়িয়ে চলে যেতে চাইলে তার জামা ছিঁড়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) তার ঘরে চলে আসেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.) ভাবলেন, হয়তো হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছেন। তাই তিনিও রওয়ানা হন যেন তিনিও মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিজ অজুহাত উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টির আড়াল হয়ে যান। হযরত উমর (রা.) এটিই ভাবতে থাকেন যে, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে নালিশ করার জন্য গেছেন। এই ভেবে তিনি সোজা মহানবী (সা.)-এর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে দেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত নেই। কিন্তু যেহেতু তার হৃদয়ে অনুতাপ ছিল তাই তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আবু বকর (রা.)'র সাথে কঠোর আচরণ করেছি। হযরত আবু বকর (রা.)'র কোন দোষ নেই, বরং আমারই

দোষ। হযরত উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে কেউ গিয়ে বলে যে, হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র মনে এই ভাবোদয় হয় যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার যাওয়া উচিত, যেন একতরফা কথা না হয় আর আমিও যেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে পারি। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হন তখন হযরত উমর নিবেদন করছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আবু বকর (রা.)'র সাথে বাকবিতণ্ডা করেছি আর আমার দ্বারা তার জামা ছিঁড়ে গেছে। মহানবী (সা.) একথা শুনার পর তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের কী হয়েছে? সারা জগৎ যখন আমাকে অস্বীকার করে আর তোমরাও আমার বিরোধী ছিলে, তখন আবু বকরই আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং সকল অর্থে আমায় সহযোগিতা করেছে। তিনি মনক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, তোমরা কি এখনো আমাকে এবং আবু বকরকে ছাড়বে না? তিনি একথা বলছিলেন, এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) প্রবেশ করেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সত্যিকার প্রেমের দৃষ্টান্ত এরূপই হয়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন সেখানে প্রবেশ করেন তখন তিনি কী পন্থা অবলম্বন করেছেন- এ শিরোনামে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, সত্যিকার প্রেমের দৃষ্টান্ত এরূপই হয়; কোনরূপ অজুহাত উপস্থাপন না করে, অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দোষ ছিল না, বরং উমরের দোষ ছিল'- একথা না বলে তিনি যখন দেখলেন, মহানবী (সা.)-এর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এক সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে তিনি এটি সহ্য করতে পারেন নি যে, আমার কারণে মহানবী (সা.)-এর কোনরূপ কষ্ট হবে। তিনি উপস্থিত হয়েই মহানবী (সা.)-এর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েন এবং নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উমরের কোন দোষ ছিল না, দোষ আমার!' দেখ, হযরত আবু বকর (রা.) কত নিষ্ঠাবান প্রেমিক ছিলেন! তাঁর প্রেমাস্পদের মনে কোনরূপ কষ্ট হোক তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি। রসূল (সা.)-কে হযরত উমর (রা.)'র প্রতি অসন্তুষ্ট হতে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) আনন্দিত হন নি। সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো, যখন সে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বকা খেতে দেখে তখন খুশি হয় আর ভাবে যে, 'ভালোমতো বকা খেয়েছে!' কিন্তু মহানবী (সা.) কোনরূপ কষ্ট পাবেন- এই সত্যিকার প্রেমিক সেটি পছন্দ করেন নি। তিনি (মনে মনে) বলেন, 'আমিই (বরং) অপরাধী হয়ে যাই, তবুও আামি আমার প্রেমাস্পদকে মর্মাহত হতে দিব না।' আর পরম বিনয়ের সাথে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! উমরের কোন দোষ ছিল না; অপরাধ আমার।' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) যদি মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও অপরাধী হওয়ার স্বীকারোক্তি দেন আর এজন্য তিনি মনে কোন কষ্ট না পান, তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে খোদার সন্তুষ্টির জন্য একজন মু'মিন বান্দা সেকাজ করবে না? একজন মু'মিনেরও বৈশিষ্ট্য এটিই হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করবে এবং এমন কোন কাজ করবে না যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন ।

এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একস্থানে বর্ণনা করেন,

একবার হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট তওরাতের একটি কপি নিয়ে এসে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটি তওরাত।' মহানবী (সা.) তাঁর কথা শুনে নীরব হয়ে

যান, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তওরাত খুলে পড়া আরম্ভ করেন। ফলে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন প্রকাশ পায়। হযরত আবু বকর (রা.) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত উমর (রা.)'র প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি (রা.) বলেন, 'তুমি কি দেখছ না, মহানবী (সা.) এটি অপছন্দ করছেন?' তাঁর কথা শুনে হযরত উমর (রা.)'রও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর চেহারার প্রতি তাকিয়ে যখন মহানবী (সা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেন, তখন তিনি (রা.) তাঁর (সা.) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি একটি আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টি মূলতঃ হযরত উমর (রা.)'র তওরাতের এমন আয়াত পাঠ করার কারণে ছিল যা ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী ছিল; এই অসন্তুষ্টি নিছক তওরাত পাঠ করার কারণে ছিল না। কারো যদি এর তফসীর পাঠ করার আগ্রহ থাকে তাহলে তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ডে সূরা নূরের ৩য় আয়াতের আলোচনায় এসংক্রান্ত বিস্তারিত তফসীর লিপিবদ্ধ রয়েছে; সেখানে দেখে নিতে পারেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য যেভাবে করতেন তার প্রমাণ হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনায় বিদ্যমান। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যখন আরবের কতক গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন পরিস্থিতি এতটাই নাজুক ছিল যে হযরত উমর (রা.)'র মত মানুষ তাঁকে তাদের সাথে নমনীয়তা প্রদর্শন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) জবাবে বলেন, 'মহানবী (সা.) স্বয়ং যে আদেশ প্রদান করেছেন, আবু কোহাফার পুত্রের তা রহিত করার কী ক্ষমতা আছে? খোদার কসম! মহানবী (সা.)-এর যুগে এরা যদি উটের পা বাঁধার রশিও যাকাত হিসেবে প্রদান করতো, তবে আমি সেই রশিও তাদের কাছ থেকে নিয়ে ছাড়ব আর তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তবেই ক্ষান্ত হব।' এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'এ ব্যাপারে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে না পারো তাহলে করো না; আমি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।' নবীর আনুগত্যের এ কত বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত! চরম বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণের লড়াই না করার পরামর্শ প্রদান সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি (রা.) সব ধরনের বিপদ মাথা পেতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান!

একইভাবে উসামা (রা.)'র বাহিনীর (যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে) যাত্রা স্থগিত করার জন্য সাহাবীরা অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'শত্রু যদি মদীনা দখল করার মত শক্তি অর্জন করে নেয় আর মুসলিম নারীদের লাশ নিয়ে কুকুর যদি টানা-হেঁচড়াও করে, তবুও আমি সেই সেনাবাহিনী প্রেরণ স্থগিত করতে পারি না যা স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।'

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমার কাছে যদি বাহরাইনের ধনসম্পদ আসে তাহলে আমি তোমাকে এতটা এতটা করে দিব। [হাতের ইশারায় বলেছিলেন।] কিন্তু সেই সম্পদ তখন (মুসলমানদের) হস্তগত হয় যখন মহানবী (সা.)-এর প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল। বাহরাইনের সম্পদ যখন হস্তগত হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) ঘোষককে নির্দেশ দেন; [অর্থাৎ ঘোষণা করান] এবং সে ঘোষণা দেয়, 'মহানবী (সা.)-এর কাছে কারো যদি কোনো পাওনা থাকে অথবা [তিনি (সা.)] কাউকে কিছু দিবেন

বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সে যেন আমাদের কাছে আসে।' বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণা শুনে আমিও তাঁর কাছে যাই এবং বলি, 'মহানবী (সা.) আমাকে এরূপ এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে তিন অঞ্জলি ভরে ভরে দিলেন। [অর্থাৎ তিনবার দু'হাত ভরে দিলেন]। আলী বিন মাদিনী বলেন, সুফিয়ান (রা.) উভয় হাত একত্রিত করে পূর্ণ অঞ্জলি নির্দেশ করেন যে, এভাবে তিনবার দিয়েছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, বাহরাইন থেকে যখন ধনসম্পদ এল তখন আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র ঘোষককে একথা বলতে শুনলাম যে, যাকে মহানবী (সা.) কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে যেন আসে। লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসলে তাদেরকে তিনি (রা.) (সেই সম্পদ থেকে) প্রদান করতেন। এরপর হযরত আবু বশীর মা'যানী (রা.) আসেন। তিনি (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'হে আবু বশীর! আমাদের কাছে যখন কোনো ধনসম্পদ আসবে তখন আমাদের কাছে এসো।'" তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দুই অথবা তিন 'লাব' (অঞ্জলি ভরে) দিলেন যা গণনা করে তিনি ১৪শ' দিরহাম বুঝে পেলেন। [লাব শব্দের অর্থ হলো দু'হাত ভরে]।

একদা হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন এবং কিছুক্ষণ পর তিনি নিজ সেবককে বললেন, 'আমাকে পানি পান করাও।' সেবক কিছুক্ষণ পর একটি মাটির পাত্রে পানি নিয়ে এলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উভয় হাত দিয়ে পানপাত্র ধরলেন এবং পিপাসা নিবারণের জন্য নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসতেই তিনি দেখলেন যে, পাত্র পানি মিশ্রিত মধুতে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি (রা.) সেই পাত্রটি রেখে দিলেন এবং পানি পান করলেন না। এরপর সেবকের দিকে তাকালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কী?' সেবক বলল, 'পানিতে মধু মিশিয়ে দিয়েছি।' হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পানি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁর চোখ থেকে অশ্রুবন্যা বইতে লাগলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কান্নার স্বর আরও উঁচু হয়ে গেল এবং তিনি ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লোকেরা তাঁর প্রতি মনোযোগী হলো এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলো আর বলল, 'হে রসূলের খলীফা! আপনার কী হয়েছে? আপনি এত বেশি কেন কাঁদছেন? আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন কাঁদছেন?' কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কান্না থামালেন না, বরং আশপাশের সকলেও তাঁকে দেখে কান্না শুরু করল এবং কাঁদতে কাঁদতে তারা নীরবও হয়ে গেল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) অনবরত কাঁদতেই থাকলেন। তাঁর অশ্রু যখন সামান্য সংবরণ হল তখন লোকেরা তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করল যে, 'হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! কী কারণে এত কান্নাকাটি? কিসে আপনাকে এত কাঁদালো?' হযরত আবু বকর (রা.) নিজ কাপড়ের আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে নিজেকে সংবরণ করে বললেন, 'আমি মহানবী (সা.)-এর মুমূর্ষু অবস্থার দিনগুলোতে তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি নিজ হাত দ্বারা কোনো কিছুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু সে বস্তুটি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি ক্ষীণস্বরে বলছিলেন, 'আমার থেকে দূর হও, আমার থেকে দূর হয়ে যাও!' আমি এদিক-সেদিক তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি আপনাকে দেখলাম কোনো বস্তুকে আমি নিজের থেকে দূরে সরাচ্ছেন, অথচ আপনার আশপাশে কিছু দৃশ্যমান ছিল না।' হুযুর (সা.) আমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বললেন,

‘এটি মূলতঃ দুনিয়া ছিল যা নিজের সকল চাকচিক্য ও নেয়ামতসহ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তাকে বলছিলাম, দূর হয়ে যাও। [কাশফের (তথা দিব্যদর্শনের) একটি অবস্থা তাঁর ওপর বিরাজ করছিল।] সে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল, ‘আপনি আমার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন তাতে কী! যারা আপনার পরে আসবে তারা আমার হাত থেকে কখনও বাঁচতে পারবে না’।’ হযরত আবু বকর (রা.) দুশ্চিন্তায় নিজের মাথা নাড়লেন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, ‘হে লোকসকল! এই মধু মিশ্রিত পানির কারণে আমি ভয় পেলাম যে এই পার্থিবতা যেন আমাকে ঘিরে না ফেলে; এই কারণে আমি ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম।’ [হৃদয়ে তিনি এতটাই আল্লাহ্ তা’লার ভয় লালন করতেন।]

ইরাক বিজয়ের পর একটি মূল্যবান চাদর হস্তগত হয়। হযরত খালেদ (রা.) সেনাবাহিনীর পরামর্শে সেই চাদরটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)’র কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন আর লিখেন, ‘আপনার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে, আপনি এটি গ্রহণ করুন।’ কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তা নেয়া পছন্দ করেন নি, এমনকি নিজের আত্মীয়দেরও দেন নি; বরং এটি হযরত ইমাম হুসায়েন (রা.)’র হাতে সোপর্দ করেন। অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে হবে।

এখন আমি দু’জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাচ্ছি এবং এরপর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম জানাযা মোহতরম সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের, যিনি তাহরীকে জাদীদের উকিলুয যিরাআত ছিলেন। ঊননব্বই (৮৯) বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন রহমতুল্লাহ সিয়াল সাহেব। সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের বংশে আহমদীয়াত আসে তার পিতা রহমতুল্লাহ সিয়াল সাহেবের মাধ্যমে , যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)’র যুগে ১৯৩৮ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। সে সময় সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের বয়স ছিল চার বছর। যখন তার মাতা বয়আতের সংবাদ পান তখন নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করে তাঁকে সাথে নিয়ে চলে যান। যখন এই ঘটনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)’র সমীপে উপস্থাপন করা হয় তখন হুযুর তার পিতাকে বলেন, ‘আপনি মামলা করুন এবং সন্তান ফেরত নিন।’ তদনুযায়ী মামলা করে সন্তান ফেরত নেয়া হয়। এভাবে তিনি তার পিতার অভিভাবকত্বে চলে আসেন আর তিনিই তার লালন-পালন করেন। সামীউল্লাহ সিয়াল সাহেবের পিতা বিশৃঙ্খলার সময় পূর্ব পাঞ্জাবে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর তার সকল অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করে, জামা’ত থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন নি। ১৯৪৯ সালে তা’লীমুল ইসলাম হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে তা’লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে লাহোর সরকারী কলেজ থেকে পরিসংখ্যানে এম.এ পাশ করেন। তার দুই পুত্র; একজন কানাডাতে ডাক্তারি করেন, অপরজন ইফতিখারুল্লাহ সিয়াল সাহেব যিনি রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদের ইনচার্জ; তিনি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী)। ১৯৪৯ সালে সিয়াল সাহেব জীবন উৎসর্গ করেন এবং অন্যান্য ওয়াকফে যিন্দেগীদের সাথে তার পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হয় এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)’র নির্দেশ অনুযায়ী তিনি উচ্চতর

শিক্ষা অর্জনের জন্য তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, লাহোরে ভর্তি হন যেখান থেকে তিনি পরিসংখ্যানে বি.এসসি এবং এরপর এম.এসসি ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৫৩ সনে দপ্তরে তার প্রথম নিযুক্তি হয় আর এরপর তিনি বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সন পর্যন্ত সিয়েরালিওনে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৩ সনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) উকিলুয্ যিরাআত এবং সানাআত ও তিজারাত মনোনীত করেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত উকিলুদ্ দিওয়ান এবং ১৯৯৯ থেকে ২০১২ সন পর্যন্ত উকিলুয্ যিরাআত এবং সানাআত ও তিজারাত পদে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন; ২০১২ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উকিলুয্ যিরাআত ছিলেন। তার দায়িত্ব পালনের সময়কাল ৬৯ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও তিনি আঞ্জুমান ও তাহরীক জাদীদের অনেকগুলো কমিটির সদস্য ছিলেন এবং কয়েকটি নিবন্ধিত কোম্পানীর পরিচালকও ছিলেন। অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও মোহতামীম হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে সুদীর্ঘকাল কাজ করার সুযোগ পান।

তার সহধর্মিণী আমাতুল হাফীয সিয়াল সাহেবা বলেন, ৬৪ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমি দেখেছি, তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান, সহমর্মী, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাশীল এবং আদর ও স্নেহশীল একজন মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিটি কাজে নিজের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিতেন এবং যুগ খলীফার নির্দেশাবলীকে সকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলেন, বিয়ের পর শুরুতেই তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী আর একজন ওয়াকেফে যিন্দেগীর স্ত্রীও ওয়াকেফে যিন্দেগী হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, তিনি দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল ছিলেন আর আমাদের বাড়িতে অনেক বেশি আতিথেয়তা করা হতো।

তার ছেলে ইফতেখার উল্লাহ্ সিয়াল সাহেব বলেন, শৈশব থেকেই তার মাঝে জামা'তের প্রতি অনেক বেশি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা ছিল। ১৯৪৭ সনের বিশৃঙ্খলার সময় তার পিতা শহীদ হলে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে যান; আর যেভাবে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার পিতাই কেবল আহমদী ছিলেন আর তার মাও (তাদেরকে) ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তখন আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে বলে, 'তুমি আহমদীয়াত ছেড়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার সমস্ত জাগতিক ও পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করব।' কিন্তু আহমদীয়াতের প্রতি ভালোবাসা এবং আহমদীয়াতের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে তিনি (তাদেরকে) উত্তর দেন, 'ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরলেও আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না'; আর পরে সর্বদাই এই ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জীবন উৎসর্গের ধারাবাহিকতা যেন তার বংশধরের মাঝেও চলমান থাকে– এ বিষয়ের তার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলেন, তাই আমি যখন ওয়াক্‌ফ করি তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন। যখন এখানে বা লন্ডনে আসেন, তখন তিনি নিজে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে (এ সংবাদ) দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, 'এটিই আসল ওয়াকফ'; অর্থাৎ এই ধারা যেন পরবর্তিতে সন্তানসন্ততির মাঝেও চালু থাকে। জাগতিক বা ধর্মীয় সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হতেন এবং সেই কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্ত কাকুতিমিনতি করে দোয়া করতেন।তার আরেক পুত্র লিখেন, আমি সারা জীবনে একবারও তাকে তাহাজ্জুদ নামায কামাই দিতে দেখি নি। দরিদ্রদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুর পর অনেক লোক এসে আমাকে বিশেষ করে বলেছে, যখনই আমাদের কোনো অর্থের প্রয়োজন পড়তো আমরা তৎক্ষণাৎ সিয়াল সাহেবের কাছে যেতাম,

আর তিনি আমাদের সব সময় সাহায্য করতেন। কোন সময় বাড়িতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আর সেই একই সময়ে জামা'তের অন্য কোনো দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি জামা'তের কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন আর বাড়ির সমস্যাকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিতেন।

তার পুত্রবধু বলেন, সব সময়ই তিনি আমাকে জামা'তের প্রতি ভালোবাসা এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পাঠ দিতেন। যুগ খলীফার মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দের প্রতি তার সর্বোচ্চ বিশ্বাস ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, শুরুতে যখন ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হন তখন চার্চিল ৮০ বছর বয়সে সবেমাত্র দ্বিতীয়বার প্রধান মন্ত্রী হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে বলেন, 'চার্চিল যদি ৮০ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে তাহলে তোমরা কেন এ বয়স পর্যন্ত জামা'তের সেবা করতে পারবে না?' তিনি বলেন, 'তখনই আমি একথার যে ফলাফল নির্ণয় করেছিলাম তা হলো- এই গ্রুপে আমরা যে কয়জনই ওয়াকেফে যিন্দেগী রয়েছি, আমাদের বয়স কমপক্ষে ৮০ বছর অবশ্যই হবে, আর আল্লাহ্ তা'লা ৮০ বছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করবেন।' বস্তুতঃ চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব, মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব উনার সঙ্গী ছিলেন, তারা সবাই ৮০ বছরের অধিক আয়ু পেয়েছেন– এটি তার পুত্রের বর্ণনা।

তার পুত্রবধু বলেন, শৈশবেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। শ্বশুররূপে আমি তার কাছ থেকে পিতৃস্নেহ লাভ করেছি। ২২ বছরের বৈবাহিক জীবনে সর্বদাই আমি তার কাছ থেকে স্নেহ ও পিতার ভালোবাসাই পেয়েছি। আহমদীয়াতের খাঁটি প্রেমিক এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী, দরিদ্রদের প্রতিপালনকারী, অতিথিপরায়ণ খাঁটি একজন মানুষ ছিলেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতেন। ছোট ছোট বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। আমার সন্তানদের তরবিয়তেও তিনি বড় ভূমিকা রেখেছেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ শিখতে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, আবার পরীক্ষাও নিতেন। তিনি বলেন, বাচ্চারা যখনই দাদার সাথে বসতো সব সময় তিনি (তাদের কাছে) জামা'তের ইতিহাস এবং খলীফাদের অনুগ্রহ ও ভালোবাসার ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। যত ছোট বাচ্চাই ঘরে আসুক না কেন, তাকেও আদর-আপ্যায়ন ছাড়া ঘর থেকে যেতে দিতেন না।

নায়েব উকিলুয্ যিরাআত বাসেল সাহেব লিখেন, সামীউল্লাহ্ সিয়াল সাহেব অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। দপ্তরের কর্মচারীদেরও তিনি আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। সবর্দা যুগ খলীফার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, সর্বদা তিনি এ শিক্ষাই দিতেন যে, জামা'তের এক একটি পয়সারও সুরক্ষা করতে হবে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এ চিন্তা নেই যে অর্থ কোথা থেকে আসবে; বরং আসল চিন্তার বিষয় হলো- অর্থ তত্ত্বাবধানকারী কোথা থেকে আসবে অথবা পাওয়া যাবে।

তিনি আরো বলেন, যখনই কোনো ওয়াকেফে যিন্দেগী বা কর্মকর্তা অথবা কোনো আহমদী সাক্ষাতের জন্য আসতো তাকে তিনি বলতেন, জামা'তের সেবা করার মাঝে অনেক বরকত রয়েছে, এবং যে সেবা করে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সীমাহীন অনুগ্রহ করেন আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার চাহিদা পূর্ণ করতে থাকেন। নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতেন, আমি

কিছুই ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক দিয়েছেন আর এটি শুধু ওয়াকফের কল্যাণেই (লাভ হয়েছে)।

নাসরীন হাই সাহেবা বলেন, আমাদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। আমার পিতামাতা সর্বদাই তাকে অনেক সম্মান করতেন। তার কোন কন্যা ছিল না। আমার বয়স যখন ৭/৮ বছর হয় তখন তিনি এবং ফুফু আমাকে পালক নেন। এরপর থেকে আমার বিয়ে পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই থাকি। তারা উভয়েই সর্বদা আমাকে আপন মেয়ের মত লালনপালন করেছেন এবং শৈশব থেকে আমার সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুরব্বীর সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন।

ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, একবার তিনি বলেন, আমি বি.এ পাশ করার পর আমার প্রাথমিক পদায়ন হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র নির্দেশে আমাকে এম.এ করতে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি চলছিল। ওই সময় দপ্তরে কেউ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র কাছে এই শঙ্কা ব্যক্ত করে বলে যে, 'আপনি তাকে এম.এ করাচ্ছেন; এম.এ পাশ করার পর সে না আবার অন্য কোথাও চলে যায়!' অর্থাৎ সে না আবার জাগতিক কোনো চাকুরিতে যোগ দিয়ে বসে। একথা শুনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'সিয়াল কখনো বিশ্বাসঘাতক হয় না।

তাহরীকে জাদীদের জায়েদাদ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ওয়াকফে যিন্দেগী ইমরান বাবর সাহেব বলেন, তার সাথে আমার ১৫ বছরের অধিক কাল কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি খুবই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। জামা'তের কাজে কখনো কোনো সরকারি কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে বা (তাদের সাথে) আলাপ আলোচনা করতে সংকোচ করতেন না। ট্রেনে সফর করার সুযোগ হলে সফরকালে অবশ্যই তবলীগ করতেন এবং উঁচু স্বরেই করতেন যেন কাছাকাছি অবস্থানকারী সবাই তা শুনতে পায়।

উকিলুল মাল-১ লোকমান সাহেব বলেন, খিলাফতের আহ্বানে নিজেও সাড়া দিতেন এবং অন্যদেরও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। সব সময়ই যখন তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা হতো তৎক্ষণাৎ আসতেন এবং চাঁদা ইত্যাদি আদায় করতেন বা ওয়াদা লিখাতেন।

তাহরীকে জাদীদ দপ্তরের শেখ হারেস সাহেব বলেন, আমি যখন ওয়াকফ করি, তখন তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। খুবই ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত নির্ভিক ও সাহসী ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। জামা'তের সম্পদ সাশ্রয়ের ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন। হারেস সাহেব আরো লেখেন, ২০১৫ সালে পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার জাভেদ সাহেব বিশেষ সফরে ইসলামাবাদ থেকে রাবওয়া আসেন। অন্যান্য বুযুর্গরা ছাড়াও সিয়াল সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ করানো হয়। এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতেও তিনি তবলীগের সুযোগ হাতছাড়া হতে দেন নি এবং তাকে খুব সুন্দরভাবে তবলীগ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন, তার যে ওয়াকেফে যিন্দেগী পুত্র রয়েছেন তাকেও ওয়াকফের দায়িত্ব উত্তমরূপে পালনের সৌভাগ্য দিন এবং তার বংশধরদের খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে প্রশান্তি দিন।

পরবর্তী জানাযা মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মরহুম আলী আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া সিদ্দীকা বেগম সাহেবার। সম্প্রতি তিনি ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র আব্দুল হাদী তারেক সাহেব একজন মুরব্বী সিলসিলা এবং

(বর্তমানে) জামেয়া আহমদীয়া ঘানায় শিক্ষকতা করছেন। কাদিয়ানের কাছাকাছি তার জন্ম হয়েছিল। তার পিতা আব্দুর রহমান সাহেব ১৯৪৪ সালে যৌবনেই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার বিধবা মা নওয়াব বিবি সাহেবা ও তার সন্তানদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন; তিনি তাদেরকে কাদিয়ান ডেকে পাঠান এবং নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা (রা.) তাদেরকে নিজ বাংলোয় রাখেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, অধমের নানি হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দেশবিভাগের পর আমার নানিকে নিজ সন্তানদের সাথে সিন্ধুর নাসেরাবাদ পাঠিয়ে দেন; সেখানে তারা বড় হন।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.)'র পুত্রবধূ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর পুত্রবধূ ছিলেন, একজন ওয়াকেফে যিন্দেগীর সহধর্মিনী ছিলেন এবং একজন ওয়াকেফে যিন্দেগীর মা ছিলেন। তিনি নিজের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে ওয়াকফের পূর্ণ চেতনা নিয়ে ওয়াকেফে যিন্দেগীর মতই জীবন কাটিয়েছেন এবং সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সঙ্গ দিয়েছেন। সারাজীবনে কখনো কারো কাছে কিছু চান নি বা দাবি করেন নি। অজস্র গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এগুলোর মাঝে বিনয়, খোদাভীরুতা, দরবেশী , আতিথেয়তা, নম্রতা, সরলতা, স্বল্পে-তুষ্টি, শালীনতা, ধৈর্য, অদম্য মনোবল বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সারাজীবনে কখনো কারো ব্যাপারে অভিযোগ ও অনুযোগ করেন নি, কিংবা কখনো কারো বদনাম শুনেনও নি বা বদনাম করেনও নি। আপন-পর সবার সাথে সব সময় ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করতেন। পাঁচবেলার নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। তেমনিভাবে নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং শেষ বয়সে অসুস্থতার মাঝেও যখন ঠিকভাবে নামায পড়তে পারতেন না, তখন এই দোয়া করতেন- 'হে প্রভু! এতটা সুস্থতা ও মনোবল দান কর যেন তোমার ইবাদত ঠিকভাবে করতে পারি।'

তার অবর্তমানে তিনি দুই মেয়ে ও তিন ছেলে রেখে গেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, তার এক পুত্র আব্দুল হাদী তারেক সাহেব ঘানায় জামাতের মুরব্বী আর সেখানে কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে নিজ মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন, তাদেরকে তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সামর্থ্য দিন এবং মরহুমার প্রতি দয়া ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার করুন, আর তার পদমর্যাদা উন্নত করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)